بسم الله الرحمن الرحيم

যুক্তরাজ্যের (টিলফোর্ড, সারেস্থ) ইসলামাবাদের মুবারক মসজিদে প্রদত্ত সৈয়্যদনা আমীরুল মু'মিনীন হযরত মির্যা মসরূর আহমদ খলীফাতুল মসীহ্ আল্ খামেস (আই.)-এর ২২ আগস্ট, ২০২৫ মোতাবেক ২২ যহুর, ১৪০৪ হিজরী শামসী'র জুমুআর খুতবা

তাশাহ্হুদ, তা'ঊয এবং সূরা ফাতিহা পাঠের পর হুযূর আনোয়ার (আই.) বলেন,

মহানবী (সা.)-এর সীরাত বা জীবনীর আলোকে যুদ্ধ অথবা লড়াইসমূহের আলোচনা হচ্ছিল। এই প্রসঙ্গেই আজ হুনাইনের যুদ্ধেরও উল্লেখ করব। এই যুদ্ধ অষ্টম হিজরীর শাওয়াল মাসে সংঘটিত হয়েছিল। এটিকে হুনাইনের যুদ্ধ কেন বলা হয়– তার কারণ হলো, হুনাইন হচ্ছে মক্কা ও তায়েফের মধ্যবর্তী একটি জনপদের নাম, যা মক্কা থেকে প্রায় ছাব্বিশ কিলোমিটার দূরত্বে অবস্থিত। এই যুদ্ধ সেই স্থানেই হয়েছিল, তাই একে হুনাইনের যুদ্ধ বলা হয়। এই যুদ্ধে অংশগ্রহণকারী বড়ো গোত্র ছিল হাওয়াযিন, তাই একে হাওয়াযিনের যুদ্ধও বলা হয়। কেউ কেউ একে আওতাসের যুদ্ধও বলেছেন; কারণ শত্রুবাহিনীর একটি অংশ হুনাইন থেকে পালিয়ে আওতাস নামক উপত্যকায় চলে গিয়েছিল এবং মুসলমানরা সেখানে পৌঁছে শত্রুদের পরাজিত করেছিল, তাই কেউ কেউ এই নাম দিয়েছেন। যদিও অধিকাংশ লেখক আওতাসের অভিযানের উল্লেখ পৃথকভাবে করেছেন।

হুনাইনের যুদ্ধের উল্লেখ পবিত্র কুরআনে এভাবে এসেছে:

لَقَدْ نَصَرَكُمُ اللّٰهُ فِيْ مَوَاطِنَ كَثِيْرَةٍ ۙ وَّيَوْمَ حُنَيْنٍ ۙ اِذْ اَعْجَبَتْكُمْ كَثْرَتُكُمْ فَلَمْ تُغْنِ عَنْكُمْ شَيْـًٔا وَّضَاقَتْ عَلَيْكُمُ الْاَرْضُ بِمَا رَحُبَتْ ثُمَّ وَلَّيْتُمْ مُّدْبِرِيْنَ

ثُمَّ اَنْزَلَ اللّٰهُ سَكِيْنَتَهٗ عَلٰى رَسُوْلِهٖ وَعَلَى الْمُؤْمِنِيْنَ وَاَنْزَلَ جُنُوْدًا لَّمْ تَرَوْهَا ۚ وَعَذَّبَ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا ۚ وَذٰلِكَ جَزَآءُ الْكٰفِرِيْنَ

ثُمَّ يَتُوْبُ اللّٰهُ مِنْۢ بَعْدِ ذٰلِكَ عَلٰى مَنْ يَّشَآءُ ۚ وَاللّٰهُ غَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ (সূরা আত-তাওবা: ২৫-২৭)

অর্থাৎ, 'নিশ্চয়ই আল্লাহ্ অনেক ক্ষেত্রে তোমাদের সাহায্য করেছেন এবং বিশেষত হুনাইনের দিনেও, যখন তোমাদের সংখ্যাধিক্য তোমাদেরকে অহংকারী করে তুলেছিল, কিন্তু তা তোমাদের কোনো কাজেই আসে নি। আর পৃথিবী প্রশস্ত হওয়া সত্ত্বেও তোমাদের জন্য তা সংকীর্ণ হয়ে গিয়েছিল, তখন তোমরা পিঠ দেখিয়ে পালিয়েছিলে। এরপর আল্লাহ্ তা'লা তাঁর রসূল ও মুমিনদের ওপর স্বীয় প্রশান্তি অবতীর্ণ করেন এবং এমন সৈন্যদের অবতীর্ণ করেন যাদেরকে তোমরা দেখতে পাচ্ছিলে না। আর যারা অস্বীকার করেছিল তাদেরকে তিনি শাস্তি দেন, আর অস্বীকারকারীদের প্রতিফল এরূপই হয়ে থাকে। আর এরপরও আল্লাহ্ যার ক্ষেত্রে ইচ্ছা তওবা কবুল করে ক্ষমা করে দেবেন। আর আল্লাহ্ অত্যন্ত ক্ষমাশীল, বার বার কৃপাকারী।'

এর কারণ এটি হয়েছিল যে, মক্কা যখন বিজিত হয়– তখন পর্যন্ত আরবের বড়ো বড়ো গোত্রসমূহ হয় ইসলাম গ্রহণ করে নিয়েছিল, নতুবা মহানবী (সা.)-এর বশ্যতা স্বীকার করে নিয়েছিল। কিন্তু মক্কার কাছেই বসবাসকারী বনু হাওয়াযিন ও বনু সাকীফ গোত্র, যারা অত্যন্ত উদ্ধত ও যুদ্ধবাজ গোত্র ছিল– তারা শুধু আনুগত্য স্বীকার করতেই অস্বীকার করে নি, বরং তাদের নেতারা একত্রিত হয়ে বলতে থাকে, মুহাম্মদ (সা.) মক্কাসহ আরবের গোত্রসমূহকে নিজের অনুগত ও অধীন বানিয়ে নিয়েছেন। এখন নিশ্চয়ই তিনি আমাদের দিকে অগ্রসর হবেন। তাই উত্তম হলো, তারা আমাদের দিকে এগোনোর আগেই আমরা

নিজেরাই তাদের ওপর আক্রমণ করব। [অর্থাৎ, তারা নিজেরাই এটি ধারণা করে নেয়।] আর এটিও বলতে থাকে যে, মুহাম্মদ (সা.) এখন পর্যন্ত অনভিজ্ঞ লোকদের মুখোমুখি হয়েছে, আমাদের সাথে এ পর্যন্ত তাদের সংঘাত হয় নি।

বনু হাওয়াযিনের সাথে সাকীফ, নসর ও জুশাম গোত্রের সকল যোদ্ধা যোগ দেয়। সা'দ বিন বকর ও বনু হিলাল গোত্র থেকেও কিছু লোক যোগ দেয়। কতক বর্ণনা থেকে জানা যায়, বনু হাওয়াযিন প্রকৃতপক্ষে এর অনেক আগে থেকেই মুসলমানদের মোকাবিলা করার প্রস্তুতি শুরু করে দিয়েছিল। কারণ তারা যখন দেখল, মুহাম্মদ (সা.) ধীরে ধীরে ইহুদীসহ অন্যান্য গোত্রকে নিজের অধীনস্থ করে চলেছেন, তখন তারা এই ভেবে উদ্‌বিগ্ন হয় যে, মূর্তিপূজা একেবারে নিশ্চি¡ না হয়ে যায় আর মুহাম্মদ (সা.) তাঁর সাথিদের নিয়ে সবার ওপর জয়ী না হয়ে যান! তাই তাদের পথ রোধ করা আবশ্যক। অতএব এর জন্য তারা প্রস্তুতি শুরু করে দেয় এবং উরওয়া বিন মাসউদের নেতৃত্বে একটি প্রতিনিধি দল জর্ডানের জুরুশ শহরে পাঠায় যেন সেখান থেকে অস্ত্র ও যুদ্ধের সরঞ্জামাদি নিয়ে আসা যায়। আর বনু হাওয়াযিনের এই প্রস্তুতির খবর এভাবে পাওয়া যায় যে, মহানবী (সা.) যখন মক্কা বিজয়ের জন্য মদীনা থেকে মক্কার দিকে রওয়ানা হবার সিদ্ধান্ত নেন, তখন তিনি (সা.) অগ্রবর্তী দল হিসেবে কিছু লোককে বাহিনীর সামনে পাঠিয়ে দেন। এই অগ্রবর্তী দল হাওয়াযিনের এক ব্যক্তিকে গ্রেফতার করে, যে একজন গুপ্তচর ছিল এবং হাওয়াযিনের পক্ষ থেকে মুসলমানদের ওপর নজর রাখার জন্য ঘুরে বেড়াচ্ছিল। মহানবী (সা.) যখন তার কাছে জিজ্ঞেস করেন এবং ভালোভাবে জিজ্ঞাসাবাদ করেন তখন সে জানায়, বনু হাওয়াযিন প্রচুর সৈন্য একত্রিত করেছে এবং বনু সাকীফকেও নিজেদের সাথে যুক্ত করে নিয়েছে এবং ভারী অস্ত্র ও সরঞ্জামের জন্য জুরুশে প্রতিনিধিদল পাঠিয়েছে। বনু হাওয়াযিন এই প্রস্তুতির মাঝেই ছিল, ইতিমধ্যে মক্কা বিশেষ কোনো প্রতিরোধ ছাড়াই সহজেই জয় হয়ে যায়। যার ফলে হাওয়াযিন গোত্র তাদের শক্তির অহংকারে এই সিদ্ধান্ত নেয় যে, আমরা নিজেরাই মুহাম্মদ (সা.) ও তাঁর সাহাবীদের মোকাবিলার জন্য বের হবো। আর যেমনটি তাদের ধারণা ছিল– 'আমরাই হচ্ছি তারা, যারা মুসলমানদের পরাজিত করে তাদের নির্মূল করতে পারি'– এজন্য সেই সমস্ত গোত্র হাওয়াযিন গোত্রের নেতা, ত্রিশ বছর বয়সী যুবক মালিক বিন অওফকে নিজেদের সেনাপতি ও নেতা বানায় এবং বিশ হাজারের বাহিনী তৈরি হয়ে হুনাইনের দিকে অগ্রসর হতে থাকে।

বনু হাওয়াযিনের সর্দার মালিক বিন অওফ এই যুদ্ধের প্রস্তুতির জন্য এমন একটি পদক্ষেপ নেয় যা আরবের ইতিহাসে সম্ভবত এর আগে কেউ নেয় নি। আর তা হলো, সেনাপতি প্রতিটি গোত্রের প্রত্যেক ব্যক্তিকে নির্দেশ দেয়, সে যুদ্ধের জন্য নিজের ঘর থেকে একা বের হবে না, বরং নিজের স্ত্রী-সন্তান, এমনকি নিজের সকল সম্পদ ও পশুপাল সাথে নিয়ে বের হবে। আর এটি দ্বারা তার উদ্দেশ্য ছিল, তার বাহিনীর প্রতিটি সৈনিক বীরত্বের সাথে প্রাণপণ যুদ্ধ করবে। এই কথা তার মনে থাকবে যে, তার জন্য পলায়নের কোনো পথ নেই, কারণ তার স্ত্রী-সন্তান ও সকল সম্পদ তার সাথেই রয়েছে।

এই যুদ্ধে একজন বৃদ্ধ সর্দার দুরাইদ বিন সিম্মাহর যুদ্ধে বাধা দেবারও উল্লেখ পাওয়া যায়, যে হাওয়াযিনের সাথে ছিল। লেখা আছে, বনু জুশামের মধ্যে দুরাইদ বিন সিম্মাহ নামে এক ব্যক্তি ছিল যার বয়স একশ বছরের অধিক ছিল। সে একজন বৃদ্ধ ব্যক্তি ছিল যার দৃষ্টিশক্তি হারিয়ে গিয়েছিল। তার মাঝে যুদ্ধ করার শক্তি ছিল না, কিন্তু সে অভিজ্ঞ এবং যুদ্ধের

কৌশল সম্পর্কে ভালোভাবে অবগত ছিল। কোনো এক সময়ে বীরত্ব ও অশ্বারোহণে তার খ্যাতি ছিল। তারা তাকেও সাথে নিয়ে গিয়েছিল যেন তার অভিজ্ঞতা ও দক্ষতা থেকে উপকৃত হতে পারে।

যখন মালিক বিন অওফ লোকদের সাথে মিলে আল্লাহ্‌র রসূল (সা.)-এর দিকে এগিয়ে যাবার ব্যাপারে একমত হয় এবং লোকেরা তাদের সম্পদ, তাদের স্ত্রী-পুত্রদের নিয়ে বের হয়, এমনকি তারা আওতাস উপত্যকায় পৌঁছে যায় এবং তাঁবু স্থাপন করে, তখন বৃদ্ধ দুরাইদ বিন সিম্মাহ নীচে নেমে নিজের হাত দিয়ে মাটি স্পর্শ করে বলে, তোমরা কোন উপত্যকায় আছো? তখন তারা বলে, আওতাস উপত্যকায়। সে বলে, এটি ঘোড়া চলাচলের জন্য ভালো জায়গা, (মাটির) কাঠিন্যের দিক থেকে কোনো অসুবিধা নেই; এত নরম নয় যে, খুর দেবে যাবে। কিন্তু আমি শিশুদের কান্নার আওয়াজ এবং উট, গাধা, ছাগল ও গরুর আওয়াজ কেন শুনতে পাচ্ছি? তখন লোকেরা উত্তর দেয়, মালিক বিন অওফের নির্দেশে সকল শিশু, নারী এবং গবাদি পশু সাথে আনা হয়েছে। তখন দুরাইদ মালিককে বলে, তুমি তোমার জাতির সর্দার। আজকের দিনের প্রভাব বাকি দিনগুলোর ওপর পড়বে। এই শিশু, উট, গাধা, ছাগল ও গরু কেন সাথে নিয়ে এসেছ? সে উত্তর দেয়, আমি চাই, আমি প্রত্যেক মানুষের পেছনে তার পরিবার-পরিজনকে দাঁড় করিয়ে দেবো, যেন সে শত্রুর সাথে প্রাণপণ লড়াই করে। দুরাইদ বলে, এটি অত্যন্ত ভুল মতামত। আল্লাহ্‌র কসম, তুমি শুধু ভেড়া চরাতেই জানো। [অর্থাৎ সে বলে, তুমি লড়াই করতে জানো না, তোমার লড়াইয়ের বিষয়ে কিছুই জানা নেই।] তারপর বলে, পরাজিত দলের পক্ষে কোনো জিনিস কি ফিরে পাওয়া সম্ভব? শোনো, যুদ্ধে তোমাদের উপকারার্থে শুধু এই বিষয়টিই রয়েছে যে, মানুষের বর্শা ও তরবারি কাজে আসবে। আর যদি যুদ্ধের ফলাফল তোমাদের বিপক্ষে যায় তাহলে তোমরা তোমাদের স্ত্রী-সন্তান ও সম্পদ হারিয়ে বসবে। হে মালিক! তুমি হাওয়াযিনের যোদ্ধা ও অশ্বারোহীদের কেন এগিয়ে দাও নি? সম্পদ, নারী ও শিশুদের নিজ জাতির দুর্গসমূহে পাঠিয়ে দাও, তারপর ঘোড়ায় চড়ে তাদের সাথে যুদ্ধ করো এবং পদাতিক বাহিনী অশ্বারোহী বাহিনীর মাঝখানে থাকবে। যদি তোমাদের সফলতা লাভ হয়, তাহলে এরা অর্থাৎ এই লোকজন, শিশু, সম্পদ ও পশুপাল তোমাদের সাথে এসে মিলিত হবে। আর যদি তোমরা ব্যর্থ হও, তাহলে তোমরা তাদের কাছে চলে যেতে পারবে। এভাবে তোমাদের পরিবার-পরিজন ও সমস্ত গবাদি পশু রক্ষা পাবে। মালিক বিন অওফ বলে, আল্লাহ্‌র কসম! আমি এমনটি করব না এবং আমার সিদ্ধান্তও পরিবর্তন করব না। তুমি বৃদ্ধ হয়ে গেছো, তোমার বুদ্ধি লোপ পেয়েছে। দুরাইদ বলে, হে হাওয়াযিনের দল! আল্লাহ্‌র কসম, এই মতামত সঠিক নয়! এই ব্যক্তি তোমাদের নারীদের অপমানিত করবে এবং তোমাদেরকে শত্রুর হাতে সমর্পণ করে নিজে সাকীফের দুর্গসমূহে গিয়ে লুকিয়ে পড়বে। সুতরাং তোমরা ফিরে আসো এবং একে পরিত্যাগ করো। এভাবে সে যুদ্ধ না করার পরামর্শ দেয়। এতে মালিক অর্থাৎ যাকে সর্দার বানানো হয়েছিল– সে তার তরবারি বের করে এবং বলে, হে হাওয়াযিনের দল! আল্লাহ্‌র কসম, তোমাদেরকে আমার আনুগত্য করতে হবে, নতুবা আমি আমার সমস্ত ভার এই তরবারির ওপর ছেড়ে দিয়ে এটি দ্বারা আমার বুক এফোঁড়-ওফোঁড় করে দেবো। অর্থাৎ আত্মহত্যা করব। বনু হাওয়াযিন গোত্র পরস্পর পরামর্শ করে বলে, আল্লাহ্‌র কসম! যদি আমরা মালিকের অবাধ্যতা করি তাহলে সে নিজেকে মেরে ফেলবে, অথচ সে যুবক; তার বয়স ত্রিশ বছরের কাছাকাছি ছিল। তখন আমরা দুরাইদের সাথে থেকে যাব আর সে বৃদ্ধ, তার সাথে মিলে যুদ্ধ করা যাবে না। (অতএব) তোমরা মালিকের সাথে একমত হও। বস্তুত তা-ই হয়।

মালিক দুরাইদকে জিজ্ঞেস করে, এর বাইরে আর কোনো মতামত আছে কিনা? তখন দুরাইদ বলে, হ্যাঁ, লুকানোর স্থানসমূহে তোমার লোকদের লুকিয়ে রাখো যারা তোমাদের সাহায্যকারী হবে। যদি শত্রু তোমাদের ওপর আক্রমণ করে তাহলে এরা তাদের পেছন থেকে আক্রমণ করবে। তাহলে তোমরা নিজেদের সঙ্গীসাথিদের নিয়ে পুনরায় আক্রমণ করতে পারবে। আর যদি তোমরা আক্রমণ করো তাহলে তাদের মধ্যে একজনও পেছনে সরবে না। তখন মালিক তার সাথিদের বলে, তারা যেন গিরিপথ ও উপত্যকার পাদদেশে লুকিয়ে থাকে। প্রথম আক্রমণটি একেবারে একসাথে করতে হবে যেন ইসলামী বাহিনীকে পরাজিত করা যায়।

মহানবী (সা.)-এর কাছেও বনু হাওয়াযিনের প্রস্তুতির খবর পৌঁছে গিয়েছিল, যার বিস্তারিত বিবরণ এরূপ; পূর্বেও কিছুটা বর্ণিত হয়েছিল: আল্লাহ্‌র রসূল (সা.)-এর কাছে মক্কায় এসব ঘটনার সংবাদ পৌঁছলে মহানবী (সা.) হাওয়াযিন গোত্রের বাহিনীর অবস্থার খোঁজখবর নেবার জন্য হযরত আবদুল্লাহ্ বিন আবু হাদরাদ আসলামীকে পাঠান। প্রথমে তাদের (অর্থাৎ শত্রুপক্ষের) সেই গুপ্তচর কিছু সংবাদ দিয়েছিল যে, অস্ত্র সংগ্রহ করা হচ্ছে। এখন এই প্রস্তুতি সম্পন্ন হবার পর তিনি (সা.) সংবাদ সংগ্রহের জন্য আবার নিজের একজন লোক প্রেরণ করেন, যিনি ছিলেন আবদুল্লাহ্ বিন আবু হাদরাদ আসলামী। তিনি হাওয়াযিনের বাহিনীতে প্রবেশ করেন এবং তাদের ভেতর ঘোরাঘুরি করে সব ধরনের তথ্য সংগ্রহ করেন। তিনি এক বা দুই দিন তাদের মাঝে অবস্থান করেন, এমনকি তিনি মালিককে একথাও বলতে শোনেন যা সে তার সাথিদের উৎসাহ বৃদ্ধির জন্য বলছিল যে, মুহাম্মদ (সা.) ইতিপূর্বে এমন কোনো জাতির সাথে যুদ্ধ করেন নি যারা যুদ্ধের কলাকৌশল জানে। তিনি এমন জাতির যুবকদের সাথে যুদ্ধ করেছেন যাদের যুদ্ধের জ্ঞান নেই, তাই তিনি তাদের ওপর বিজয়ী হয়েছেন। অতএব প্রভাত হবার সাথে সাথেই তোমরা তোমাদের পেছনে গবাদি পশুপাল এবং তোমাদের নারীদের সারিবদ্ধ করে নিও, তারপর একযোগে আক্রমণ কোরো। আর তোমরা তোমাদের তরবারির খাপ ভেঙে ফেলো ও বিশ হাজার উন্মুক্ত তরবারির মাধ্যমে লড়াই কোরো এবং একজন বীরপুরুষের ন্যায় আক্রমণ রচনা কোরো। আর তোমরা ভালোভাবে জেনে রাখো– বিজয় তারাই লাভ করবে, যারা সর্বপ্রথম আক্রমণ করবে। অতঃপর হযরত আব্দুল্লাহ্ বিন আবু হাদরাদ মহানবী (সা.)-এর কাছে আসেন এবং তাঁকে সমস্ত সংবাদ প্রদান করেন। মহানবী (সা.) বাধ্য হয়ে মোকাবিলা করার প্রস্তুতি গ্রহণ করেন। মহানবী (সা.) বনু হাওয়াযিন গোত্রের সাথে মোকাবিলা করার জন্য মক্কা থেকে রওয়ানা হবার পূর্বে সমীক্ষা করলে দেখা যায়, আসন্ন যুদ্ধের জন্য ইসলামী সৈন্যবাহিনীর নিকট যুদ্ধসামগ্রী অনেক কম ছিল। এই ঘাটতি পূরণের জন্য মহানবী (সা.) মক্কার ধনাঢ্য সর্দার সাফওয়ান বিন উমাইয়ার কাছে কিছু অস্ত্র ধার চান– যে তখনো মুশরিক ছিল। সে মহানবী (সা.)-কে বলে, আপনি কি আমার সম্পদ ধার নিতে চান নাকি জোরপূর্বক নিয়ে নিতে চান? তিনি (সা.) বলেন, না! আমি ধারস্বরূপ নিতে চাচ্ছি এবং এগুলো ফেরত দেবার নিশ্চয়তাও দিচ্ছি। তখন সে দেবার জন্য রাজি হয়ে যায়। সে একশ বর্ম দেয় যার সাথে শিরস্ত্রাণ এবং ঢাল প্রভৃতিও ছিল। কিছু বর্ণনামতে, এই অস্ত্রসমূহ স্থানান্তরের জন্য সে সাথে করে উটও দিয়েছিল। যুদ্ধের পর সাফওয়ানের বর্মগুলো ফেরত দেবার জন্য একত্রিত করা হলে সেখানে কিছু বর্ম কম ছিল। বর্মগুলো যেহেতু ফেরত দেবার জামানত দেওয়া হয়েছিল, তাই মহানবী (সা.) সাফওয়ানের সাথে কথা বলেন যে, সেগুলোর মূল্য নিয়ে নাও। কিন্তু বর্মগুলো দেবার সময় যে সাফওয়ান ছিল, এখন আর সে সেই সাফওয়ান ছিল না। সাফওয়ান নিজেও হুনাইনের

যুদ্ধে অংশ নিয়েছিল। অবশ্য সেসময় সে মুশরিক ছিল এবং হুনাইনের যুদ্ধের পর সে ইসলাম গ্রহণ করেছিল। অর্থাৎ যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেছিল ঠিকই, কিন্তু মুশরিক ছিল; আর হুনাইনের যুদ্ধের পর ইসলাম গ্রহণ করে। এ কারণে মহানবী (সা.) বর্মগুলোর মূল্য দিতে চাইলে সাফওয়ান বলে, لا يا رسولَ اللهِ؛ لأنَّ في قلبي اليومَ ما لم يكُنْ يومئذٍ – জি না, হে আল্লাহ্‌র রসূল (সা.)! কেননা আজ আমার হৃদয়ের অবস্থা যেমন– সেদিন তেমনটি ছিল না। সে (ক্ষতিপূরণ) নিতে অস্বীকৃতি জানায়। একইভাবে মহানবী (সা.) আপন চাচাতো ভাই নওফেল বিন হারেস-এর কাছ থেকেও তিন হাজার বর্শা ধার নেন এবং বলেন, আমি তোমার এসব বর্শা শত্রুদের পিঠে বিদ্ধ হতে দেখতে পাচ্ছি। মহানবী (সা.)-এর এই কথার মাঝে এ সংবাদ নিহিত ছিল যে, শত্রুরা পরাজয় বরণ করে পালাবে এবং তাদের অনেক প্রাণহানি ঘটবে। একইভাবে ইবনে আবি রবিয়া-র কাছ থেকেও কিছু অস্ত্র ধার নিয়েছিলেন। মহানবী (সা.)-এর মহান চরিত্রের বহিঃপ্রকাশ প্রণিধানযোগ্য যে, তিনি (সা.) মক্কা বিজয় করে নিয়েছিলেন। এখন এটি একটি বিজিত জাতি ছিল আর যুদ্ধনীতি অনুযায়ী বিজয়ীরাই বিজিত জাতির সমস্ত ধনসম্পদের মালিক হয়ে থাকে। কিন্তু যুদ্ধের জন্য যখন অস্ত্রের প্রয়োজন দেখা দেয় তখন প্রতিটি অস্ত্র ধার নেওয়া হয়। আর এই অঙ্গীকার করা হয় যে, আমরা যতগুলো অস্ত্র নিচ্ছি ঠিক ততগুলো ফেরত দেবো। একইভাবে আবু জাহলের সৎভাই আব্দুল্লাহ্ বিন আবি রবিয়ার কাছ থেকে মহানবী (সা.) ত্রিশ-চল্লিশ হাজার দিরহাম ঋণস্বরূপ গ্রহণ করেন। রেওয়ায়েতে বর্ণিত হয়েছে, এ ব্যক্তি মক্কা বিজয়ের দিন মুসলমান হয়ে গিয়েছিলেন।

একটি রেওয়ায়েত অনুযায়ী মহানবী (সা.) কুরাইশের তিনজন ব্যক্তির কাছ থেকে ঋণ নিয়েছিলেন। তিনি (সা.) সাফওয়ান বিন উমাইয়ার কাছ থেকে পঞ্চাশ হাজার দিরহাম, আব্দুল্লাহ্ বিন আবি রবিয়ার কাছ থেকে চল্লিশ হাজার দিরহাম এবং হুওয়াইতিব বিন আব্দুল উযযার কাছ থেকে চল্লিশ হাজার দিরহাম ঋণ নিয়েছিলেন। সর্বমোট এক লক্ষ ত্রিশ হাজার দিরহাম। কিছু রেওয়ায়েত অনুযায়ী, মক্কা বিজয়ের সময় মহানবী (সা.) দরিদ্র সাহাবীদের জন্য নগদ অর্থ ঋণ নিয়েছিলেন– যা তিনি (সা.) তাদের মাঝে বণ্টন করে দিয়েছিলেন আর প্রত্যেক ব্যক্তিকে কমবেশি পঞ্চাশ দিরহাম করে দেওয়া হয়েছিল। আরেকটি রেওয়ায়েত অনুযায়ী, বনু জাযীমার নিহত ব্যক্তিদের রক্তপণ ইত্যাদি আদায় করার উদ্দেশ্যে এ অর্থ ঋণস্বরূপ নেওয়া হয়েছিল। হতে পারে, মহানবী (সা.) নানাবিধ প্রয়োজনের তাগিদে এ অর্থ ঋণস্বরূপ নিয়েছিলেন, যার মাঝে আর্থিক সহযোগিতা এবং রক্তপণ অন্তর্ভুক্ত। আল্লাহ্ তা'লাই ভালো জানেন; ওয়াল্লাহু আ'লামু। এর বিস্তারিত বিবরণ আগামীতে বর্ণনা করব, ইনশাআল্লাহ্।

নামাযের পর আমি দুইজন ব্যক্তির গায়েবানা জানাযা পড়াবো। একজন হলেন মরহুম খাজা মোখতার আহমদ বাট সাহেব, যিনি সিয়ালকোটের খাজা আব্দুর রহমান সাহেবের পুত্র ছিলেন। সম্প্রতি তিনি ৯২ বছর বয়সে ইন্তেকাল করেছেন, إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ। তিনি সিয়ালকোটে জন্মগ্রহণ করেছিলেন। আইনশাস্ত্রে শিক্ষা লাভের পরে তিনি এয়ার ফোর্সে যোগদান করেন। রিসালপুর থেকে এয়ার ফোর্সের প্রশিক্ষণ গ্রহণ করেন এবং ১৯৭৪ সাল পর্যন্ত পাকিস্তান এয়ার ফোর্সে একজন আইন বিষয়ক কর্মকর্তা হিসেবে বিশেষ সেবা প্রদান করেন। সেই বছর অন্যান্য আহমদী কর্মকর্তার সাথে তাকেও চাকরি থেকে বরখাস্ত করা হয়। ১৯৭৪ সালে জামা'তে আহমদীয়ার বিরুদ্ধে সহিংসতার একটি সংবেদনশীল মুহূর্তে তিনি খলীফাতুল মসীহ্ সালেস (রাহে.)-র নির্দেশনা অনুযায়ী জামা'তের আইন কমিশনে কাজ

করেন এবং জামা'তের চেষ্টাপ্রচেষ্টার অংশ হিসেবে পাঞ্জাবের মুখ্যমন্ত্রী হানিফ রামে-র সাথে সাক্ষাৎ করেন। হযরত মির্যা বশীর আহমদ সাহেব (রা.) এবং হযরত চৌধুরী জাফরুল্লাহ্ খান সাহেব (রা.)-র সঙ্গে তার গভীর সম্পর্ক ছিল এবং Essence of Islam-এর প্রথম খণ্ড প্রস্তুত করার ক্ষেত্রে হযরত চৌধুরী জাফরুল্লাহ্ খান সাহেব (রা.)-কে সহযোগিতা করার সুযোগ পেয়েছেন। কেন্দ্রীয় পর্যায়ে তিনি ফযলে উমর ফাউন্ডেশনের পরিচালক এবং বহু বছর রাবওয়ার দারুল কাযায় কাযী হিসেবে সেবা প্রদান করেন। দারুল কাযায় আমিও কিছুদিন তার সাথে কাজ করেছি। তিনি অত্যন্ত বিচক্ষণ এবং বিনয়ী মানুষ ছিলেন। খিলাফতের সাথে সর্বদাই তার গভীর সম্পর্ক ছিল এবং পরবর্তীতে আমার সাথেও তার হৃদ্যতাপূর্ণ সম্পর্ক ছিল। ২০০২ সালে তিনি কানাডায় চলে যান এবং সেখানে আঞ্চলিক আমীর হিসেবে সেবা প্রদান করতে থাকেন। নামায ও কুরআন তিলাওয়াতে নিয়মিত ছিলেন এবং আর্থিক কুরবানীতে অনেক বেশি অংশগ্রহণকারী একজন নিষ্ঠাবান, ত্যাগী আহমদী ছিলেন। তার জীবন খিলাফতের প্রতি বিশ্বস্ততা, বিনয় এবং আন্তরিকতার উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত ছিল।

শোকসন্তপ্ত পরিবারে স্ত্রী ছাড়াও এক কন্যা এবং দুই পুত্রসহ বহু নাতি-নাতনি রয়েছেন। তার স্ত্রী আমাতুল কাইয়্যুম সাহেবা হলেন মরহুম গোলাম আহমদ আখতার সাহেবের কন্যা। গোলাম আখতার সাহেব রেলওয়েতে ডাইরেক্টর পদে কর্মরত ছিলেন; অর্থাৎ অনেক বড়ো পদে ছিলেন। অবসর গ্রহণের পর খলীফাতুল মসীহ সানী (রা.)-র যুগে কিছু সময়ের জন্য নাযেরে আলা হিসেবেও দায়িত্ব পালন করেছেন। হযরত খলীফাতুল মসীহ সানী (রা.) স্টেজে বক্তৃতা প্রদানের সময় তাঁর নিরাপত্তার দায়িত্বও পালন করেছেন। সর্বদা সেবা প্রদানকারী পরিবারের সদস্য ছিল।

ইউকের কাযা বোর্ডের প্রধান ডা. জাহিদ খান সাহেবের শ্বশুর ছিলেন খাজা ইফতেখার সাহেব। খাজা সাহেবের মেয়ে আয়েশা খান লিখেছেন, আমি তাকে সর্বদা খিলাফতের প্রতি আনুগত্যশীল পেয়েছি। আমাদের তিন ভাইবোনের তরবিয়ত এভাবে করেছেন– জামা'ত এবং খিলাফতের আনুগত্য ব্যতীত আমাদের জীবনের ভিন্ন কোনো উদ্দেশ্যে থাকা অনুচিত; এটিই আমাদের শিখিয়েছেন। ১৯৭৪ সালে এয়ার ফোর্সের চাকরির হঠাৎ সমাপ্তি এবং ব্যক্তিগতভাবে ওকালতি পেশায় তেমন একটা সাফল্য না পাওয়া সত্ত্বেও কখনোই তিনি ধৈর্য এবং আল্লাহ্ তা'লার ওপর পূর্ণ আস্থা হারান নি। কোনো মানুষের কাছে সাহায্যের হাত বাড়ান নি; নিজের যাবতীয় প্রয়োজন তিনি আল্লাহ্ তা'লার নিকটেই উপস্থাপন করেছেন। তার কন্যা বলেন, যখন থেকে আমি বুঝতে আরম্ভ করেছি, তখন থেকে তাকে সর্বদা একজন ইবাদতকারী হিসেবেই দেখতে পেয়েছি এবং প্রতিটি পুণ্য কাজে তাকে অংশগ্রহণকারী পেয়েছি। চাঁদা সর্বদা মাসের শুরুতেই প্রদান করতেন এবং যদি টাকা থাকত তাহলে অগ্রীম চাঁদা প্রদান করতেন। আত্মীয়তার সম্পর্ক রক্ষা করার ক্ষেত্রে খুবই অগ্রগণ্য ছিলেন। যেমনটি আমি বলেছি, খিলাফতের সাথে অত্যন্ত বিশ্বস্ততার সম্পর্ক তো ছিলই, জামা'তের ব্যবস্থাপনার প্রতিও পরম অনুগত ছিলেন। তার অন্য সব ভাইও জামা'তের ব্যবস্থাপনা ও খিলাফতের সাথে একান্ত নিষ্ঠাপূর্ণ সম্পর্ক রাখেন; তাদের পিতাও তা রাখতেন, কেননা তিনিই তাদের এভাবে তরবিয়ত করেছেন। আল্লাহ্‌র ফযলে এই পুরো পরিবারই জামা'তের সাথে পরম বিশ্বস্ততা প্রদর্শনকারী।

যেমনটি আমি বলেছি, তার সহধর্মিণী আখতার সাহেবের কন্যা ছিলেন। এটিও একটি সেবক পরিবার। যাহোক, স্বামী-স্ত্রী উভয়ের তরবিয়ত বা সুশিক্ষার ফলেই তাদের সন্তানরাও

জামা'তের সঙ্গে আন্তরিক সম্পর্ক রাখে এবং জামা'তের সেবায় নিয়োজিত আছে। আল্লাহ্ তা'লা তাদের সন্তানদেরকে তাদের সৎকর্মগুলো অব্যাহত রাখার সৌভাগ্য দান করুন এবং মরহুমের প্রতি ক্ষমা ও দয়ার আচরণ করুন।

দ্বিতীয় জানাযা ও স্মৃতিচারণ হলো ভারতের নাযীর আহমদ সাহেবের সহধর্মিণী সাঈদা বেগম সাহেবার। সম্প্রতি ৭৫ বছর বয়সে তিনি ইহলোক ত্যাগ করেছেন, إِنَّا لِلّٰهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ। আল্লাহ্ তা'লার ফযলে তিনি মূসিয়া ছিলেন। শোকসন্তপ্ত পরিবারে স্বামী ছাড়াও তিন কন্যা ও চার পুত্র রেখে গেছেন; কাদিয়ানের নায়েব নাযের ইসলাহ ও ইরশাদ তাহের আহমদ তারেক সাহেবের মা ছিলেন। তাহের আহমদ সাহেব জামা'তের প্রতিনিধিত্বে এখানে ইংল্যান্ডে এসেছিলেন এবং সেসময় তার মা ইন্তেকাল করার কারণে জানাযায় উপস্থিত থাকতে পারেন নি। এটিও অত্যন্ত সেবক একটি পরিবার। তার ছোটো ছেলে, তাহের সাহেবের ভাই শাব্বীর আহমদ সাহেবও জামা'তের একজন মোয়াল্লেম; তেমনিভাবে তার এক মেয়েও মুরব্বী সিলসিলাহ জাব্বার সাহেবের সহধর্মিণী। অন্য দুই পুত্রও জামা'তের সেবায় নিয়োজিত। এটিও অত্যন্ত সেবক একটি পরিবার। আল্লাহ্ মরহুমার প্রতি ক্ষমার আচরণ করুন।

তাহের আহমদ তারেক সাহেব লিখেছেন, গত পঁচিশ বছর যাবৎ তার মা শ্বাসকষ্টে ভুগছিলেন এবং পরম ধৈর্য ও গাম্ভীর্যের সাথে তিনি অসুস্থতার সময় পার করেছেন, কখনোই অভিযোগ-অনুযোগ করেন নি। তিনি জম্মু-কাশ্মীরের চারকোট রাজৌরির অধিবাসী ছিলেন। হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর সাহাবী হযরত কাজী মুহাম্মদ আকবর ভাট্টি সাহেবের মাধ্যমে তাদের বংশে আহমদীয়াতের সূচনা হয়। পরবর্তীতে তাদের পরিবারে আহমদীয়াত বিস্তৃতি লাভ করে। তিনি অত্যন্ত ধার্মিক এবং নামায ও রোযার প্রতি যত্নবান ছিলেন। স্বল্পশিক্ষিতা হওয়া সত্ত্বেও শৈশবে সন্ধ্যা হলে আমাদের কুরআনের দোয়া, হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর নযম, হাদীস ও নবীদের ঘটনা শোনাতেন। তিনি খুবই পরিপাটি ও পরিচ্ছন্ন স্বভাবের ছিলেন। তিনি খুবই মিশুক এবং আত্মীয়স্বজনের সঙ্গে স্নেহ ও ভালোবাসা প্রদর্শনকারিণী ছিলেন। তিনি খিলাফত ও জামা'তের ব্যবস্থাপনার প্রতি গভীর ভালোবাসা পোষণ করতেন। আর স্বেচ্ছায় আমাদেরকে ওয়াকফ বা উৎসর্গ করেছেন এবং ওয়াকফের দায়িত্ব পালনের বিষয়ে সর্বদা উদ্‌বুদ্ধ করতেন। তিনি প্রতিদিন আমাদেরকে কুরআন শেখার জন্য প্রস্তুত করে পাঠাতেন। এর পাশাপাশি আমাদের জাগতিক শিক্ষাদীক্ষার বিষয়েও মনোযোগী ছিলেন। প্রত্যেক সন্তানকেই উত্তম শিক্ষা দিয়েছেন। আল্লাহ্ তা'লা তার প্রতি ক্ষমা ও অনুগ্রহের আচরণ করুন। (আমীন)

(কেন্দ্রীয় বাংলাডেস্কের তত্ত্বাবধানে অনূদিত)